Rajshahi University journal of arts & law Vol. 48 (2020) pp. 77-95
ISSN 2309-0898

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলিম আরবের সংযোগ স্থাপনে আল-বিরূনীর অবদান

গুলশান আকতার[১], মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান[২]

Abstract

Al-Biruni (362 AH/973 AD-440 AH/1048 AD) is one of the Muslim scholars who has played a pivotal role in various branches of science throughout the ages. He was a pioneer of science and has made outstanding contributions to almost every branch of science. At the end of the tenth century, when a stagnation almost engulfted the world of science, Al-Biruni was one of those who, in the pursuit of knowledge, saved science from serious stagnation. That is why it is no exaggeration to say that Al-Biruni is the foremost among all the famous men who created new trends in the world of science in the middle ages and led science in a new direction. Al-Biruni's biography is very significant for those who judge the golden moments of life in terms of principles and ideologies and hope to build their lives around those. His objective and impartial research in Indian epistemology has given him a permanent place in history. He is called the 'Founder of Indology'. Nevertheless, the Muslim Ummah seems to have forgotten the contribution of Al-Biruni in recent time. Therefore, this paper highlights Al-Biruni's contributions to science to familiarize the new generation with his life and contribution with glimpses of Al-Biruni's short biography, books and his outstanding contribution to the connection of Mulsim Arabia in various branches of Science.

ভূমিকা

মধ্যযুগে যে সকল মুসলিম মনীষী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে আল-বিরূনী এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি ছিলেন পারস্যের বিস্ময়কর প্রতিভা। তিনি একাধারে চিকিৎসা, ভূগোল, গণিত, ইতিহাসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভৃতি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। এককথায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় তার অবাধ বিচরণ ছিল। তিনি স্বাধীন চিন্তা, মুক্তবুদ্ধি, সাহসিকতা, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, নির্ভীক সমালোচক ও সঠিক মতামতব্যক্ত করার জন্য যুগশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। বহু গ্রন্থ প্রণেতা আল-বিরূনী তার প্রণীত গ্রন্থসমূহে জটিল এবং বিচিত্র তত্ত্ব ও তথ্য যেরূপ বিস্তারিতভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন তা এক বিস্ময়কর শক্তির স্মারক হিসেবে প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষ করে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞনের প্রতি মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর মৌলিক গবেষণায় আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল স্থাপিত করেছে। সারা বিশ্ব আজ তাঁর কাছে ঋণী। তাইতো অধ্যাপক মাপা বলেন, 'আল-বিরূনী শুধু মুসলিম বিশ্বেরই নন; বরং তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্যতম।'

আল-বিরূনীর সংক্ষিপ্ত জীবন পরিক্রমা

আল-বিরূনী ৩৬২ হিজরী মোতাবেক ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের খাওয়ারিজমে[১] আফ্রিগিদস রাজবংশের রাজধানী কাথের বাইরের জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।[২] তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ। তবে তিনি নিজের নাম লিখতেন আবূ রায়হান। তিনি সারা বিশ্বে আল-বিরূনী[৩] নামে সমধিক পরিচিত।[৪] তাঁর পূর্ণ নাম আবূ রায়হান মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আল-বিরূনী[৫] আল-খওয়ারিজমী[৬]।[৭] আল-বিরূনীর

[১] এম.এ শিক্ষার্থী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ই-মেইলঃ aktergulshan927@gmail.com
[২] প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, ই-মেইলঃ mahbub.ru2011@gmail.com

পিতা ছিলেন দরিদ্র। তাই তাঁর প্রাথমিক জীবন বেশি সুখের ছিল না। তিনি বাল্যকালে মাতা-পিতা উভয়কে হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েন। তবে তিনি বাল্যকালেই ইরাক বংশীয় নৃপতি আল-মনসুরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ফলে রাজকীয় অনুগ্রহের মাঝে থেকেই তিনি লেখা পড়া ও অমূল্য প্রতিভার বিকাশ ঘটান। এভাবে তার জীবনের ২২/২৫টি বছর কেটে যায়। হঠাৎ আল-বিরূনীর পৃষ্ঠপোষক নৃপতি রাজনৈতিক গোলযোগে নিহত হলে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে খাওয়ারিজম ছেড়ে জুরজানে চলে যান।[৮]

শিক্ষা জীবন

আল-বিরূনীকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠতম মুসলিম পণ্ডিত হিসাবে গণ্য করা হয়। জীবনের প্রথম ২৫ বছর তিনি খোরাসানে কাটিয়েছেন। সেখানে তিনি ফিক্হ, ধর্মতত্ত্ব, ব্যাকরণ, গণিত, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোলেও পারদর্শিতা লাভ করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে আল-উসতাদ বা শিক্ষক খেতাবে ভূষিত করা হয়। আল-বিরূনীই প্রথম ব্যাক্তি যিনি ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। ভারতে অবস্থানকালে তিনি সেখানকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং তার আহরিত জ্ঞান আরবী ভাষায় প্রচার করেন।[৯] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুনীত কুমার চ্যাটার্জি তাঁর Al-Biruni and Sanskrit নামক গ্রন্থে তাঁকে (বিরূনী) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইণ্ডোলজিস্ট বা ভারতীয় ইতিহাসবিদ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।[১০] তিনি জ্যোতির্বিদ এবং গণিতবিদ আবূ নসর মনসূর-এর তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞান চর্চা করেন। এছাড়াও তিনি তাঁর কাছে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যায়ন করেন।[১১]

আবূ কাবুস আল-মোয়ালির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ

খাওয়ারিজম ত্যাগ করে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত জুরজানে গিয়ে আল-বেরূনী স্বস্তি ফিরে পান এবং পুনরায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি জুরজানের বিদ্যোৎসাহী শাসক কাবুসের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেন। ফলে আল-বিরূনীর জীবনে ফিরে আসে সোনালী দিন। আল-বিরূনী তার দরবারে অন্যতম সভাসদ হিসেবে দুবছর অবস্থান করেন। এ সময় কাবুস আল-বিরূনীর প্রতি এতোই মুগ্ধ হন যে, রাজ্যের অর্ধেক তাকে দিয়ে দেবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু পার্থিব সম্পদের প্রতি নির্লোভ আল-বিরূনী তার প্রস্তাবে রাজী হননি। তবে কাবুসের এমন ভালোবাসার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আল-বিরূনী তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুটি গ্রন্থ 'আল-আসরুল বাকিয়া আনিল কুরনিল খালিয়া' ও 'তাজরীদূশ শুয়াত' রাজার নামে উৎসর্গ করেন।[১২]

গাজনীতে সুলতান মাহমুদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ

জুরজানে পর সম্মানে থাকলেও জন্মভূমি খাওয়ারিজমের মায়া তিনি কিছুতেই ছাড়তে পারেননি। চলে আসেন মাতৃভূমিতে। এসেই তথাকার নৃপতি আল-মামুনের সভ্যতে পরিণত হন। এর কিছুদিন পর গজনীর সুলতান মাহমুদের চিঠি পেয়ে তিনি সেখানে যান এবং তার দরবারে অসমান্য মর্যাদা লাভ করেন।[১৩]

সুলতান মাহমুদের দরবারে আল-বিরূনী জোতিষী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ফলে গজনীতে তার জীবনের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার পরিবর্তে তিনি জ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। গজনীতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের আলাপে তিনি দোভাষী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে ভারত সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন। গজনী পৌছার কিছুদিন পরই তিনি ভারত যান। ভারতে সুলতান মাহমুদের কয়েকটি অভিযানে তিনি তার সঙ্গী হয়েছিলেন। মূলত তিনি ছিলেন তার কাছে বন্দি। সুলতান মাহমুদকে পরিত্যাগ করার ক্ষমতা ছিলো না। তবে ১০১৯ থেকে ১০২৯ সাল পর্যন্ত আল-বিরূনী ভারতে অবস্থান করেন। গজনীতে ফিরে এসে তিনি গ্রন্থ রচনায় মনোযোগ দেন।

এ সময় সুলতান মাহমুদের মৃত্যু হলে গজনীতে রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। এক সংঘর্ষের পর সুলতান মাহমুদের পুত্র মাস'ঊদ সিংহাসন দখল করেন। এ সময় আল-বিরূনী কিতাবুল হিন্দ (كتاب الهند) নামক গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত ছিলেন।[১৪]

আল-বিরূনীর প্রতি সুলতান মাস'ঊদের অপরিসীম শ্রদ্ধাবোধ ছিলো ফলে সুলতান মাস'ঊদের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কানূনে মাস'ঊদী (قانون مسعودي) রচনা করেন। মাস'ঊদ এতে সন্তুষ্ট হয়ে বিরূনীকে এক হস্তী পরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা উপঢৌকন দেন। কিন্তু নির্লোভ বিজ্ঞানী তা রাজকোষে ফেরত পাঠিয়ে দেন।[১৫]

রচনাবলী

আল-বিরূনী সর্বমোট **১১৪**টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর মৃত্যুর **১৩** বছর পূর্বে একটি পত্রে তিনি নিজ গ্রন্থের যে তালিকা প্রকাশ করেছিলেন, তাতেই গ্রন্থের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল **১১৪**টি। এর পরবর্তী **১৩** বছরে হয়ত তিনি আরো অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তবে তার গ্রন্থের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। এসব গ্রন্থের মধ্যে প্রায় ২০টি গ্রন্থ তিনি ভারতীয়দের সম্বন্ধে রচনা করেছেন। তন্মধ্যে **১৩**টি গ্রন্থ অসমাপ্ত বলে জানা যায়নি।[১৬] বর্তমানে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে এক পঞ্চমাংশ গ্রন্থ টিকে আছে। কেউ কেউ বলেন, 'আল-বিরূনীর লিখিত গ্রন্থসমূহের তালিকাই ষাট পৃষ্ঠাব্যাপী। কিন্তু তন্মধ্যে সাতাশটি পাণ্ডুলিপি আজও কালের নির্মম কবল থেকে বেঁচে আছে।'[১৭] নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হলো,

(১) **কিতাবুল হিন্দ** (كتاب الهند): ভারতের ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি নিয়ে আল-বিরূনীর অবিস্মরণীয় রচনা এটি। ভারতের যে কোন ধরনের প্রামাণিক ইতিহাস রচনায় 'কিতাবুল হিন্দ' একটি অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আল-বিরূনীর শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে এ একটি গ্রন্থই তার অমরত্ব এবং প্রজ্ঞার পরিচয় হিসেবে যথেষ্ট। কিতাবুল হিন্দের জন্য তাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ বলা হয়।[১৮]

(২) **কানূন-ই-মাস'ঊদী** (قانون مسعودي): আল-বিরূনী সুলতান মাসঊদের কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ কানূন-ই-মাস'ঊদী সুলতান মাস'ঊদের নামে উৎসর্গ করেন। গ্রন্থটির জন্য সুলতান মাস'ঊদ আল-বিরূনীকে এক উট বোঝাই রৌপ্য উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু আল-বিরূনী এ উপহার সুলতানের কোষাগারে ফেরত পাঠান।

কানূন-ই-মাস'ঊদী (The Canon of Masud on astrononmy and the stars) হলো আল-বিরূনীর বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। গ্রন্থটিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ত্রিকোনমিতি নিয়েও আলোচনা রয়েছে। গ্রন্থটি **১১** খণ্ডে বিভক্ত।[১৯]

(৩) **কিতাবুত তাফহীম** (كتاب التفهيم): এটি একটি বিশুদ্ধ অংকশাস্ত্র। গ্রন্থটি কানূন-ই-মাস'ঊদীর মতো উচ্চাঙ্গের নয়। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য এটি লেখা হয়েছিলো বলে অনুমান করা হয়। আল-বিরূনী গ্রন্থটি খাওয়ারিজমের আমির আবুল হাসানের কন্যা যুবরাজ্ঞী রায়হানকে উৎসর্গ করেন। গ্রন্থটিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি, জোতিষ শাস্ত্রে ব্যবহৃত এস্ট্রোল্যাব এবং সমসাময়িক ভূগোল, তারিখ গণনা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পুরো গ্রন্থটি ৫০৩ অনুচ্ছেদে বিভক্ত।[২০]

(৪) **আল-আসারুল বাকিয়্যাহ্ 'আনিল কুরূনিল খালিয়াহ্** (الأثار الباقية عن القرون الخالية): এটি বিগত যুগসমূহের স্মারক চিহ্ন এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর রচিত গ্রন্থ।

(৫) **কিতাব আল-জামাহীর ফী মা'রিফাত আল-জাওয়াহীর** (كتاب الجماهير في معرفة الجواهر): এ বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি কয়েকটি ধাতুর ও বহু মূল্যবান প্রস্তরের বৈজ্ঞানিক বিবরণ দিয়েছেন এবং প্রত্যেকটির ব্যবসায়গত উপযোগিতা ও ঔষধ হিসেবে গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। জামাহীরে যেমন বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে ছন্দ মধুর কবিতার সংযোজনায় তাঁর রসিক মনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এ গ্রন্থটি তিনি সুলতান মওদুদকে উৎসর্গ করেন।[২১]

(৬) আল-বিরূনীর উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে: রসূমুল হিন্দ (رسوم الهند); মানসুবাতে দারব (منصوبات الضرب); মিফতাহু 'ইলমিল হায়াত (مفتاح علم الحياة); 'আলা ফী যিজে খাওয়ারিজমী(على في زيج خوارزمي); তাকমিলে যিজে হাব্‌শ বিল ই'লাল (تكميل زيج حبش بالإعلال); তাজরীদুশ শা'আত (تجريد الشعاعات); আমরোল মোমতাহান (أمر الممتحن); রিসালাহ ফী তাহজীবিল আক্বওয়াল ফী তাসহীহিল ওরূদে ওয়াল আতওয়াল (رسالة في تهذيب الأقوال في تصحيح الورود والأطوال); কিতাবুস সাইদালা ফিত্‌-তিব (كتاب الصيدلة في الطبّ) চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ। কিতাবু মাক্বালীদ আল-হাইয়াত (كتاب مقاليد الهيئة); কিতাবুল 'আমাল বিল আস্তারলাব (كتاب العمل بالاصطرلاب); কিতাবু তাসতীর আল-কুররা (كتاب تسطير الكرّة; মাক্বালাতু ফী ইস্‌তি'মালিল আস্তারলাব (مقالة في استعمال الاصطرلاب); কিতাবুয্‌ যিজে আল-মাস'ঊদী আলফুহু লিল-সুলতান মাস'ঊদ ইব্‌ন মাহমূদ মুলুকে গায্‌না (كتاب الزيج المسعودي ألفه للسلطان مسعود بن محمود ملك غزنة); মাক্বালাতু ফী তালাফি 'আওরাদ যিল্লাহ ফী কিতাবি দালাইল আল-ক্বিবলা (مقالة في تلافي عوارض الزلة في كتاب دلائل القبلة); কিতাব আল-আতলাল (كتاب الأطلال); তারীখুল উমাম আস-সারকিয়্যাহ্‌ (تاريخ الأمم الشرقيّة); রাসাইল (رسائل); তাহক্বীক্ব মা লিল হিন্দ মিন মাক্বূলাহ্‌ মাক্বুবুলাহ্‌ (تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة; মাক্বালাতু ফী এসতিখরাজেল আওতারে ফিদ দায়েরাত (مقالة في استخراج الأوتار في الدائرة); লিওয়াযাম আল-হারকাতায়ন (لوازم الحركتين); তাহ্‌দীদ নিহায়াতিল আমাকিন লিতাসহীহে মাসাফাতিল মাসাকিন (تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن); কিতাবু আছারিল 'উলূবিয়্যাহ্‌ (كتاب أثار العلوية); ইখ্‌তিলাফুল আক্বাবীল লি-ইস্তিখরাজিল তাহাবিল (اختلاف الأقاويل لاستخراج التحاويل)।[২২]

এছাড়াও তাঁর আরও গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ললিত সাহিত্য ও রম্যরচনায়ও অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি তিন-চারখানা গদ্য ও পদ্যের গ্রন্থ রচনা করেন। কঠিন গুণ-গণিতে ও নীরস বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত থেকেও তিনি মনের সজীবতা, সহজ মানবীয় অনুভূতি ও সৌন্দর্যবোধ হারাননি।

আরবী ও ফারসী দুই ভাষাতেই তাঁর সমান পারদর্শীতা থাকায় (তিনি) পাতঞ্জলীর মহাভাষ্যের আরবী অনুবাদ করেন এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থগুলিও আরবী থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। এতে তাঁর সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যে প্রচুর দক্ষতার পরিচয় মেলে।[২৩]

ইন্তিকাল

রূপকথার গল্পের মতো প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও সৃষ্টির আমোঘ বিধান তাকেও মেনে নিতে হয়েছিল। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। কিন্তু সেই অবস্থায়ও তাঁর জ্ঞান পিপাসা দূর হয়নি। অন্তিম মহূর্তে ফকীহ্‌ আবুল হুসায়ন তার অবস্থা দেখার জন্য হাজির হলে তিনি তাকে বললেন, 'আপনি একদিন কৃত্রিম মাতামহীর হিসাবটা যেন কিভাবে বলেছিলেন?' আবুল হুসায়ন

সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, 'আপনার এ অবস্থায় আমাকে সেই হিসাবটা বলতে হবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এখনি বলুন।' বিষয়টি না জেনে দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে জেনে ছেড়ে যাওয়া উত্তম। আবুল হুসায়ন তাকে হিসাবটি বুঝিয়ে বলেন। আল-বিরূনী শান্তভাবে শুনে পুনরাবৃত্তি করেন। তারপর আবুল হুসায়ন বের হয়ে আসেন। বাইরে এসে তিনি কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। ১০৪৮ সালে মুসলিম ইতিহাসের এ অবিস্মরণীয় বিজ্ঞানী গজনীতে ইন্তিকাল করেন।[২৪] তবে কেউ বলেন, 'তিনি ১০৫০ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।'[২৫]

আল-বিরূনী সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত

আল-বিরূনী একাধারে গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, পদার্থবিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, ভাষাবিদ এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ ছিলেন। মুসলিম এবং অমুসলিম নির্বিশেষে সকল পণ্ডিতই তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। নিম্নে তাঁর সম্পর্কে মনীষীগণের কয়েকটি অভিমত উল্লেখ করা হলো-

১. উমার রিদা কাহ্হালা (র) বলেন,

مُحَمَّد بن أحمد، البيروني الخوارزمي (أبو ريحان) حكيم، رياضيّ، فلكيّ، طبيبٌ، أديبٌ، لغويّ، مؤرخ.

"মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আল-বিরূনী আল-খাওয়ারিজমী (আবূ রায়হান) বিচক্ষণ (প্রজ্ঞাবান), গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, ভাষাবিদ এবং ঐতিহাসিক ছিলেন।"[২৬]

২. খায়রুদ্দীন আয্-যিরাকলী (র) বলেন,

مُحَمَّد بن أحمد، أبو ريحان البيروني الخوارزمي فيلسوف رياضي، مؤرخ

-"মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আবূ রায়হান আল-বিরূনী আল-খাওয়ারিজমী দার্শনিক, গণিতবিদ ও ঐতিহাসিক ছিলেন।"[২৭]

৩. ড. সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী তাঁর Al-Biruni and Sanskrit গ্রন্থে বলেন,

He (Al-Biruni) was the first of Scientific Indiologists and one of the greatest of all time.
"তিনি (আল-বিরূনী) ছিলেন সর্ব প্রথম সাইন্টিফিক ইন্ডালজিস্ট এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠদের অন্যতম।"[২৮]

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আল-বিরূনী একাধারে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, পদার্থ, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, ধর্মতত্ত্বসহ প্রভৃতি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। নিম্নে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান তুলে ধরা হলো।

এক. চিকিৎসা বিজ্ঞানে আল-বিরূনীর অবদান

আল-বিরূনী ছিলেন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম পণ্ডিত। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদানের পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

তাঁর সময় পর্যন্ত মুসলিম যুগের বিজ্ঞানীরা কেবল গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে আল-বিরূনীই তাদের মধ্যে প্রথম ছিলেন যারা ব্যক্তিগত ভাবে সফর করেছিলেন এবং ভারতীয়দের বৈজ্ঞানিক অবদানের সাথে তাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

যদিও চিকিৎসায় তার অবদান কেবলমাত্র ফার্মাকোলজির (Pharmacology) মধ্যে সীমাবদ্ধ, তবে এটি বিভিন্ন দিক থেকে অনন্য ছিলো। সে সময়ে ঔষধগুলি অধিকাংশ গুল্ম থেকে প্রস্তুত করা হতো।

ডাইওসকোরাইডিস, গ্যালেন, পল এবং অরিবাসিয়ান এর রচিত এই বিষয়ের পুরাতন গ্রন্থগুলো গ্রিক থেকে আরবীতে অনুবাদ করা হয়েছিলো। তবে আরবীকৃত ল্যাটিন শব্দ থেকে বিভিন্ন উদ্ভিদ সনাক্ত করতে অসুবিধা হয়েছিলো। তবে আল-বিরূনীই প্রথম এই সমস্যা দূরীভূত করেন।

আল-বিরূনী বহু রোগের ঔষধ তৈরির পদ্ধতি বিষয়ক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর অসামান্য অবদান রেখেছেন।

তিনি সে সময় ব্যবহৃত ঔষধ প্রস্তুতির পদ্ধতি এবং বিভিন্ন ভাষায় উপাদানগুলির নাম, যেমন- ভিজ, আরবী, গ্রিক, সিরীয়, পারসিয়ান, হিন্দি, সিন্ধি, জাবুবী, তিমিজী, খাওয়ারিজমী ইত্যদি নিয়ে কিতাব আস-সাইদালা (كتاب الصيدلة في الطب) নামে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[২৯]

এই কাজে তিনি সিরিয়ার খ্রিষ্টানদের দ্বারা সংকলিত দুটি গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন। ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। এ গ্রন্থটি সে সময়কার ফার্মাসিস্টদের ভেষজ ঔষধ সনাক্ত করতে সাহায্য করেছিলো।[৩০]

আর-বিরূনীর কিতাব আস-সাইদালা দুটি অংশে বিভক্ত ছিলো। যথা-

ক. প্রথম অংশে ফার্মাকোলজি (ঔষধ প্রস্তুতের পদ্ধতি ঔষধ সংক্রান্ত বিজ্ঞান) এবং চিকিৎসা থেরাপি বা ঔষধ সংক্রান্ত থেরাপি (ঔষধ ব্যবহারের পদ্ধতি) সংক্রান্ত আলোচনা বিদ্যমান। এই গ্রন্থটি প্রতিনিধিত্ব করে উল্লেখযোগ্য ফার্মাসিউটিক্যাল ও সাহিত্যিক কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে। এটি কেবল মধ্যযুগীয় আরবীয় যুগের নয় বরং সর্বকালের ফার্মেসির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অবদান।

খ. এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে মেটেরিয়া মেডিকার বিষয়গুলি বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছিলো। এতে তিনি ভেষজ ঔষধি গুলির নাম, এর প্রতি শব্দ, শারীরিক প্রাদুর্ভাব, উৎস বা উৎপত্তির স্থান, শ্রেনী বিন্যাস, কীভাবে তাদের চাষাবাদ করা যায় এবং এর সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

যেহেতু আল-বিরূনী চিকিৎসা পদ্ধতি চর্চা/অনুশীলন করেননি তাই তিনি পূর্বসূরিদের ঔষধের মাত্রা বা ডোজ এবং তা ব্যবহারের পদ্ধতি আলোচনা করেছেন। হামারনেহ এই গ্রন্থের একটি ব্যাখ্যা অংশও লিখেছেন।[৩১]

গ্রিক ফার্মাকোলজিস্টদের ন্যায় থিওফ্রাস্টাস এবং ডাইওসকোরাইডের লেখায় যৌগিক পদার্থ, ফার্মাসিউটিক্যালের প্রস্তুত প্রণালী এবং অন্যান্য বিষয়গুলি ফার্মেসি এবং মেটেরিয়া মেডিকায় কঠোরভাবে অন্তর্ভূক্ত ছিলো না, যদিও আল-বিরূনী একই বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে তিনি আল-গাফিকির জামির এক শতাব্দীরও বেশীকাল পূর্বে এই বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন।[৩২]

হামারনেহ অনেক পূর্বেই আল-বিরূনীর মেটেরিয়া মেডিকা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। আল-বিরূনী শুধুমাত্র মুসলমানদের মধ্যেই অন্যতম ছিলেননা বরং সারা বিশ্বে প্রথম (খ্রিস্টপূর্বকাল থেকে তাঁর নিজের সময়কাল পর্যন্ত) তিনিই ফার্মাকোলজি এবং মেটেরিয়া মেডিকার সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রণয়ন করেছিলেন।

তাঁর মূল পাণ্ডুলিপিটি ১৯২৭ সালে আহমদ জাকী ওলিদি এবং ও.এইচ. রিটার মাধ্যমে তুরস্কে পাওয়া যায়। মেয়ের হক এই কাজটি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং একই সাথে এই অবদানটির এক অনন্য খ্যাতি এনে দিয়েছিলেন।[৩৩]

দুই. ভূগোল

আল-বিরূনী হলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ ও ভূপর্যটক। তিনি জীবনের প্রায় ৪০ বছর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেই কাটিয়ে দিয়েছেন। তার দরুণ নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশ ও জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচয় স্থাপন করে তিনি নিজের মনীষাকেও সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর সময়ে মুসলিম ভূগোল বিজ্ঞান উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করলেও তিনি তাঁর বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা দ্বারা ভূগোলশাস্ত্রকে বেশ সমৃদ্ধ করেছেন।[৩৪] তিনি তাঁর তাহদীদু নিহায়াতিল আমাকিন (تحديد نهايات الأماكن) (Ditermination of the co-ordination) গ্রন্থের মধ্য দিয়ে গাণিতিক ভূগোলের (Geodesy) জন্ম দেন। গাণিতিক ভূগোলে অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে 'Father of Modern Geodesy' নামে আখ্যায়িত করা হয়।[৩৫] এছাড়া তিনি প্রাকৃতিক ও মানব ভূগোলেও তাৎপর্যপূর্ণ তাত্ত্বিক উন্নতি ঘটান। স্থানের অবস্থান, দূরত্ব এবং শহর ও নগরের আয়তনের বর্ণনা দিয়ে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসব গ্রন্থের মধ্যে ১৬টির সন্ধান পাওয়া গেছে।

আল-বিরূনীর কিতাবুল হিন্দ বা তাহকীক মা লিল-হিন্দ (كتاب الهند او تحقيق ما للهند) (Book of India), আল-আছারুল বাকিয়া 'আনিল কুরূনিল খালিয়া (الاثار الباقية عن القرون الخالية) (The Chronology of Ancient Nations) এবং আল-কানূন আল-মাস'ঊদী (القانون المسعودى) (Masud's Canon) হলো উল্লেখযোগ্য ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ। সি. এডওয়ার্ড সাচু আল-বিরূনীর কিতাবুল হিন্দ (كتاب الهند) ও আল-আছারুল বাকিয়া 'আনিল কুরূনিল খালিয়া (الاثار الباقية عن القرون الخالية) গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ করলেও ল্যাটিনে কেউ অনুবাদ করেননি। আল-বিরূনী তাঁর সময় পর্যন্ত ভূগোল বিষয়ক সকল জ্ঞানের সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করেন। তিনি মুসলিম ভূগোলবিদগণের পাশাপাশি গ্রিক, ভারতীয় ও পারসিক ভূগোলবিদগণের অবদানের সাথেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর মতে, ভূগোলে গ্রিকরা ছিল ভারতীয়দের চেয়ে অধিক অগ্রসর।[৩৬] তিনি শহরগুলোর সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করেন এবং তাঁর সাথে এক ডিগ্রি অক্ষাংশের দৈর্ঘ্য নিরূপণ করেন। তার মাধ্যমে আল-বিরূনী তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিতিক (Geodetic) অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করেন। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি এ কথা প্রমাণ ও প্রচার করেছিলেন যে, পৃথিবী নিজ অক্ষরেখার উপর ঘোরে অর্থাৎ সর্বপ্রথম ভূগোলের অক্ষরেখার পরিমাপ নির্ণায়ক ছিলেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবী সবকিছুকে তার কেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ করে। এছাড়াও তিনি চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সমুদ্রের জোয়ার ভাটার সম্পর্ক নির্ণয়সহ আরো বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত তথ্য আবিষ্কার করেন। তাঁর এই অমূল্য অবদানের কথা আজও আধুনিক ভূগোলবিদগণ অকপটে স্বীকার করেন।[৩৭]

মহাবিশ্বের অন্যতম ছায়াপথ মিল্কি ওয়ে (Milky Way) পরিচয় ও তার বিস্তারিত বিবরণ আল-বিরূনী অত্যন্ত সুচারুরূপে প্রদান করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম বেরিং প্রণালী আবিষ্কার করেন। তিনি সূর্যের উচ্চতার মাধ্যমে খোয়াজাম অঞ্চলের অক্ষাংশ নির্ণয় করেন। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ মেরু খুঁজে বের করার সাতটি ভিন্ন উপায়ে উদ্ভাবন করেন। এছাড়া তিনি গাণিতিক কৌশল প্রয়োগ করে ঋতু শুরুর প্রকৃত সময় নির্ণয় করেন। তিনি অ্যাস্ট্রোল্যাব (The Astrolabe)[৩৮] ও সমুদ্র তীরের পাহাড়ের মাধ্যমে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেন। তিনি জটিল ভূ-গাণিতিক সমীকরণ ব্যবহার করে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেন ৬৩৩৯.৯ কি.মি.। আর আধুনিক পরিধি হচ্ছে ৬৩৫৬.৭ কি.মি.। এই পদ্ধতি বর্তমানকালে 'আল-বিরূনী ল' (Al-Birune's Law) নামে পরিচিত।[৩৯]

আল-বিরূনী পৃথিবীর আকার এবং বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব নির্ধারণে ট্রাইঅ্যাংগলেশন (Triangulation)[৪০] কৌশল চালু করেন, যা ভূগোল শাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ইসলামী ভূগোলে

আল-বিরূনীর অবদান উল্লেখ করতে গিয়ে ইরানী ঐতিহাসিক সৈয়দ হোসেন নাসির তাঁর Islamic Science : An Illustrated Study নামক গ্রন্থে লিখেছেন, The height of Islamic geographical studies of the early period is to be found in the writings of peerless Abu Rayhan al-Biruni, at once master of mathematical descriptive and cultural geography.[৪১] -'এক সময়ের গাণিতিক, বর্ণনামূলক ও সাংস্কৃতিক ভূগোলের অদ্বিতীয় পণ্ডিত আবূ রায়হান আল-বিরূনীর লেখায় প্রাথমিক যুগে ইসলামী ভূগোল বিজ্ঞান অধ্যয়নের চূড়ান্ত উন্নতি খুঁজে পাওয়া যায়।'

আল-বিরূনী মক্কাকে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কল্পনা করে পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। এ সম্পর্কে ডেভিড এন্থনি কিং তাঁর 'World Maps for Finding The Direction and Distance to Mecca : Innovation and Tradition in Islamic Science' নামক গ্রন্থে লিখেছেন,

Al-Biruni is known to have complete several other treatiss on mathematical geography and on the determination of the qibla which have not survived; we know only their titles and the number of folios, which he lists in his bibliography, Most of these gave no impression of dealing with any kind of map, but there is one that is particularly interesting. The title is Tahdid al-ma'mura wa-tashhihuhu fil'l-sura. The determintion of the inhabited world and its correct representation on a map. The length of the treatise is not stated. How al-Biruni imagined his map we can not tell; it may well have been one of the ptolemic or ma'muniac tradition. But possibly he also considered the problem of a grid that would preserve direction and distance to the central point and even produced a Mecca centered map satisfying these criteria. We also note in passing that al-Biruni is the first person known to have used $21 : 20^0$ for θm in a set of geographical tables.[৪২]

-'আল-বিরূনী গাণিতিক ভূগোল এবং কিবলা নির্ধারণে কয়েকটি গ্রন্থ লিখেছেন বলে জানা যায়। তবে গ্রন্থগুলোর অস্তিত্ব নেই। আমরা কেবল গ্রন্থগুলোর শিরোনাম এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা জানি। গ্রন্থ তালিকায় তিনি বইগুলির নাম উল্লেখ করেছেন। এসব গ্রন্থে কোন ধরনের মানচিত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। তবে একটি বিশেষ গ্রন্থ আকর্ষণীয়। গ্রন্থটির শিরোনাম হলো তাহদীদ আল-মামুরা ওয়া তাসহীহুহু ফিল-সূরা। এ গ্রন্থটির মানচিত্রে বাসযোগ্য পৃথিবীর নির্ভুল অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। গ্রন্থটির আকার বর্ণনা করা হয়নি। আল-বিরূনী কীভাবে পৃথিবীর মানচিত্র কল্পনা করেছেন তা আমরা বলতে পারি না। সম্ভবত তা ছিল টলেমি অথবা মামুনীয় মডেলের। তবে তিনি সম্ভবত একটি গ্রিডের সমস্যাও বিবেচনা করেছিলেন. যা মূল কেন্দ্রবিন্দুর দিক-নির্দেশনা ও দূরত্ব নির্দেশ করত এবং এসব মানদণ্ড পূর্ণ করে মক্কাকেন্দ্রিক একটি মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। আল-বিরূনী হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি একটি ভৌগোলিক সারণীতে θm এর জন্য $21 : 20^0$ ব্যবহার করেছেন।'

ভূগোলের প্রতি আল-বিরূনীর অপরিসীম আগ্রহের ফলেই তাঁর এসব বৈজ্ঞানিক অবদান সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ মূল্যবান গ্রন্থে কোন না কোনভাবে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে ভূগোল বিষয়ক জ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছে। ভূগোলের মৌলিক উপাদানসমূহ করায়ত্ত করে আল-বিরূনী যেভাবে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন করেছেন তাঁর বহু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। তবে ভারতীয় ভূগোল সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল-হিন্দ (كتاب الهند)-এর পাতায় পাতায়। এ বিখ্যাত গ্রন্থে আল-বিরূনী শুধু ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনাই প্রদান করেননি; বরং সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্পর্কে যে বর্ণনা প্রদান করেছেন, সে বিষয়ে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তাঁর কাছে ভূগোল শুধু বর্ণনামূলক বিষয় নয়, এটি পরিমাণমূলকও বটে।[৪৩]

আল-বিরূনীর কিতাবুল হিন্দ (كتاب الهند) থেকে ভারতীয় ভূগোল সম্পর্কে যথাসম্ভব বিন্যস্তাকারে নিম্নে কিছু সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো:

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বর্ণনা

আল-বিরূনী বিভিন্ন শহর ও বন্দরের দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করে ভারতের উপকূল রেখার নির্ভুল অবস্থান চিহ্নিত করেন। তিনি সাগর নিয়ে গবেষণা করেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, দক্ষিণাঞ্চলীয় সাগরগুলোর মধ্যে একটি পথ রয়েছে। তিনি লক্ষ্য করে দেখতে পান, একসময় একটি প্রাচীন সাগর শুকিয়ে গিয়ে সিন্ধু উপত্যকার জন্ম হয়েছে।[৪৪]

পৃথিবীর দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত ভারত মহাসাগর সম্পর্কে আল-বিরূনী বলেন, 'এই সাগরের নামকরণ করা হয়েছে এর অন্তর্গত কিছু সংখ্যক দ্বীপ অথবা এর সীমানা চিহ্নিতকারী উপকূলীয় এলাকার ভিত্তিতে। ..... অতএব ভারতীয় উপমহাদেশ দ্বারা সীমানা চিহ্নিতকারী সাগরকে বলা হয় ভারত উপমহাসাগর।'[৪৫] প্রাচীন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিবরণ দিতে গিয়ে আল-বিরূনী লিখেছেন, 'ভারতের মধ্যস্থান হলো কনৌজ। তারা একে মধ্যদেশ বা দেশের মধ্যস্থান বলে।'[৪৬] ভারতীয় উপকূল শুরু হয়েছে মাকরানের রাজধানী তিয থেকে এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আল-দাইবাল (দেবল)-এর দিকে অগ্রসর হয়েছে। এরপর তা কছ এবং সোমনাথ হয়ে ক্যামবে উপসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। পশ্চিম উপকূলে থানা পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার পর রয়েছে বিশাল উপসাগর, যেখানে আছে সরণদ্বীপ (সরণদ্বীপ-সিংহল)। আল-বিরূনী দক্ষিণ উপকূলের করই (করোটা), কানবায়াত (ক্যাবে), বিহরোজ (ব্রোচ), টানা (থানা), রামশের (রামসেশভরম), পানজায়াভার (তানজোর) এবং সেতুবন্ধন (আদম সেতু) ইত্যাদি সহ বেশ কিছু স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন।

তিনি ভারত মহাসাগরের যে সকল দ্বীপের নাম উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হলো: যাবাজ যাকে হিন্দুরা সুবর্ণদ্বীপ অর্থাৎ স্বর্ণদ্বীপ নামে অভিহিত করতো। এই মহাসাগরের পশ্চিমাঞ্চলীয় উপদ্বীপগুলোর নাম যানজ (নেগ্রোজ), মধ্যাঞ্চলীয়ন উপদ্বীপগুলোর মধ্যে রয়েছে রাম দ্বীপপুঞ্জ এবং দিভা দ্বীপপুঞ্জ (মালদ্বীপ এবং লাকা দ্বীপ); তন্মধ্যে কুমাইর (মাদাগাস্কার) দ্বীপপুঞ্জও রয়েছে। এছাড়া সিংহল (শ্রীলংকা) সম্পর্কে বেশ কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এই দ্বীপ রাক্ষসদের দুর্গ হিসেবে পরিচিত। একইসাথে তিনি রাবণের বিরুদ্ধে রামের যুদ্ধ এবং সীতার নির্বাসন সম্পর্কিত প্রচলিত কাহিনীরও উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষের উত্তর সীমান্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে কাশ্মীরের বিস্তারিত খুঁটিনাটি বিবরণ প্রদান করেছেন এবং সিন্ধুর নদের আঁকাবাঁকা গতিপথের বিবরণ প্রদান করেছেন। আল-বিরূনী সেখানকার উঁচু পর্বত, তাদের চূড়া ও অক্ষয় বরফপুঞ্জের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'পশ্চিম দিকে রয়েছে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত আফগান উপজাতিসমূহ।'[৪৭]

এশিয়ার মধ্যভাগে ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক যেভাবে সর্পিল গতিতে পর্বতমালা এগিয়ে গেছে, তার বিপুলতা ও বিস্তার সম্পর্কে আল-বিরূনীর ধারণা ছিল প্রায় সঠিক। আবাসযোগ্য পৃথিবীতে অবস্থিত পর্বতাদির চূড়াসমূহ যে ব্যবধানে একের পর এক সাজানো আছে তার অবস্থান-নকশা দেখলে মনে হবে কোন প্রাণীর মেরুদণ্ডের হাড় পৃথিবীর মধ্যে অক্ষাংশের উপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ জুড়ে চীন, তিব্বত, তুরস্ক, কাবুল, বাদাখশান, বাসিয়ান, ঘোর, খুরাসান, মেদিয়া, আজারবাইজান, রোম সাম্রাজ্য, ফ্রান্স এবং জালালিকা (গ্যালিসিয়ান) অতিক্রম করেছে।'[৪৮]

ভারতবর্ষের উপর সীমান্তের পর্বতসমূহ যেগুলো হচ্ছে বরফাচ্ছাদিত হিমাবান্ত (হিমালয়) তার একটি প্রণালী মধ্য এশিয়ার দিকে গেছে এবং অপর অংশ গেছে ভারতের দিকে। ভারতবর্ষের উত্তর ও পূর্বদিকের পর্বতসমূহ প্রকৃতপক্ষে একই উৎস থেকে এবং একই পর্বতমালার অংশ। এগুলোর কিছু

পূর্বদিকে সম্প্রসারিত হয়েছে। অতঃপর দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়ে বিশাল মহাসাগরে (ভারত মহাসাগরে) গিয়ে মিশেছে। যে স্থানে এই পর্বতমালা সাগরে প্রবেশ করেছে তাকে বলা হয় রামের বাঁধ (Dyke of Rama)।[৪৯] অবশ্য ঠাণ্ডা ও গরমের বিবেচনায় এ সকল পর্বত পরস্পরের তুলনায় পৃথক।[৫০]

ভূবনাকোসা[৫১] থেকে উদ্ধৃত করে আল-বিরূনী বলেন, 'হিমাবান্ত (হিমালয়) থেকে আবাসযোগ্য পৃথিবীর যে অংশ দক্ষিণ দিকে নেমে এসেছে তাকে বলা হয় ভারতবর্ষ। হিমালয়ের উত্তরে ঐতিহ্যবাহী মেরু পাহাড় অবস্থিত, যা পৃথিবীর সবার উপরে মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে আছে, যার অহংকারকে কেউ ছুঁতে পারে না।'

হিমালয়ের দক্ষিণকে ভারতের বিশাল সমভূমি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমভূমির সম্ভাব্য উৎপত্তি সম্পর্কে আল-বিরূনীর মতামত যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত। তিনি বলেছেন, 'ভারতের এরূপ একটি সমভূমি উপরোল্লিখিত ভারত মহাসাগরে এসে শেষ হয়েছে এবং অপর তিন দিক পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত, যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয় সাগরের পানি। কিন্তু আপনি যদি ভারতের মাটি স্বচক্ষে দেখে থাকেন এবং এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মনোনিবেশ করে থাকেন, তাহলে দেখবেন- গোলাকার পাথরগুলোর আকার তুলনামূলকভাবে বেশ বড়। যেখানে নদীর স্রোতের বেগ কম এবং পাহাড় থেকে যতদূরে যাবেন- পাথরের আকার হবে তত ছোট। সাগরের কাছে নদীমুখে যেখানে স্রোতের বেগ স্তিমিত হয়ে পড়েছে, সেখানে পাওয়া যায় বালু আকারে চূর্ণবিচূর্ণ পাথর। এসব বিষয়কে বিবেচনায় আনলে আপনি ভাবতে অবাক হবেন যে, পুরো ভারতবর্ষ একসময় ছিল সাগর, যা একসময় স্রোতের সাথে আসা পলি দ্বারা পর্যায়ক্রমে ভরাট হয়েছে।'[৫২]

ভারতের নদীগুলোর উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো উত্তরের শীতল পাহাড় থেকে এবং পশ্চিমের পাহাড় থেকে এসেছে। আল-বিরূনী ভারতের নদী সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছেন। এগুলোর উৎস এবং গতিপথ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বিভিন্ন হিন্দুশাস্ত্রের বর্ণনা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি এসকল শাস্ত্রীয় গ্রন্থ থেকে নদীসমূহের নাম এবং যে সকল স্থানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তার তথ্যাবলী গ্রহণ করেছেন।[৫৩]

নগর সমবৃত্তে প্রবাহিত নদ-নদীর বিবরণ

যে সব বিখ্যাত পর্বতকে মেরু পর্বতের গ্রন্থি বা বাঁক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বায়ু পুরাণে সে সব বাঁক থেকে উৎসারিত নদ-নদীর একটি তালিকা স্থান পেয়েছে। আল-বিরূনী বর্ণিত তালিকা অনুযায়ী ভারতের নদ-নদীগুলো একটি বিবরণী প্রকাশ করা হয়েছে। নিচের ছকে তার বিবরণী দেয়া হলো:

বাঁক	নাগর সম্বৃত্তে প্রবাহিত নদ-নদীর নাম
মহেন্দ্র	ত্রিসাগা, ঋষিকূল্য, ইসকুল, ত্রিপাবা, অয়ন, লাঙ্গুলিনী, বংশধারা
মলয়	কৃতমালা, তাম্রবর্ণ, পুষ্পজাতি, উৎপলাবতী
সহ্য	গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণ, বৈন্য, সবঞ্জল, তুঙ্গাভদ্রা, সুপ্রয়োগ, পয়, কাবেরী
শুক্তি	রিসিকা, বালুকা, কুমারী, মন্দবাহিনী, কুপ, পলাসিনী
ঋক্ষ	সোন, মহানদ, নর্মদা, সুরস, কিরবা, মন্দাকিনী, দর্শান, চিত্রকুট, তমসা, পিপ্পল, করমোদ, পিসাবিক, চিত্রপল, মহাবেগ, বঞ্জুল, বালুবাহিনী, শুক্তিমর্তী, শক্রুন, ত্রিদিব
বিন্ধ্যা	তাপি, পয়োঞ্চী, নির্বিন্ধা, সিরব, নিষাধ, বেন্ব, বৈতরণী, সিনি, হাহু, কুমুদবতী, তোবা, মহাগৌরী, দুর্গা, অন্তঃশীলা
পরিযাত্রা	বেদস্মৃতি, বেদবতী, বৃত্রঘ্নি, পূর্ণাশা, নন্দনা, সন্দনা, রামাদি, পারা, চর্মন্বতি, লুপা, বিদিশা।[৫৪]

আরব সাগর বা রামের বাঁধে পতিত নদ-নদীর বর্ণনা:

১. সিন্ধু বিয়াত্তা, চন্দ্রভাগা, বিয়াহা, ইরাবতী, শতদ্রু বা ভাইহিন্দ বা জাইলাম বা চন্দ্রাহা বা শতদল।
২. সারসত, জৌন, গঙ্গা, সরযু, দেবিকা, কুহু।
৩. গান্ডকি, লোহিত, দৃশদ্বতী, তাম্র, অরুণা।
৪. বিদাসিনী, চন্দনা, কাওন, পারা।
৫. ভানুমতি, শিপ্রা, করতোয়া, শামহিনা।
৬. গোমতী, ধূতাপাপা, বিশাল, বাহুদশা, কৌশিকী, নিশ্চিরা।[৫৫]

আল-বিরূনী যে পঞ্চম নদী পাঞ্জাবের শাতলাদার (সাতলেজ)-এর কথা উল্লেখ করেছেন তা মুলতানের নিম্নাঞ্চলে পঞ্চনদা (পঞ্চনদ অর্থাৎ পাঁচটি নদীর মিলনস্থল) নামক স্থানে মিলিত হয়েছে এবং বিশাল জলভাণ্ডার সৃষ্টি করেছে। বন্যার সময়ে এই জলাধার স্ফীত হয়ে প্রায় ১০ ফারসাখ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৩৭ (১৯৭৩ সালের অস্বাভাবিক বন্যায় যেরূপ হয়েছিল) বিস্তৃত লাভ করে এবং এত উপরে উঠে যে, তীরবর্তী সমতল এলাকার গাছের সর্বোচ্চ চূড়া পর্যন্ত স্পর্শ করে। তাই বন্যার পর গাছের সর্বোচ্চ শাখায় আবর্জনাসমূহ এমনভাবে আটকা পড়ে, যেন পাখিরা বাসা বেঁধেছে। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, একত্রিত স্রোতধারা হিসেবে সিন্ধি নগর 'আরোর' অতিক্রম করার পর মুসলমানরা এই নদীর নামকরণ করেছে মিহরান। অতঃপর এই নদী সোজাসুজি প্রবাহিত হতে থাকে এবং ক্রমশ প্রশস্ত হতে থাকে, পানিও ক্রমশ স্বচ্ছতা লাভ করে। গতিপথে কিছু সংখ্যক দ্বীপ রেখে অবশেষে আল-মনসুরাহতে এসে পৌঁছে। আল-মনসুরাহ এমন একটি স্থান, যেখানে এই নদীর কিছু সংখ্যক শাখা এসে একত্রিত হয়েছে। অতঃপর এই নদী দুটি স্থানে এসে মহাসাগরে মিশেছে। একটি লোহারানি (করাচীর নিকটে) শহরের নিকটে এবং অপরটি পূর্বদিকে কছ প্রদেশের সিন্ধু সাগারা (সিন্দ সাগর) নামক স্থানে।[৫৬]

সোমনাথের পূর্বদিকে এক তীরের নাগালের মধ্যে (অর্থাৎ তীর ছুঁড়লে যতদূরে গিয়ে পড়া সম্ভব) দিয়ে সারাসতি (সরস্বতি) নদী প্রবাহিত হয়েছে। গঙ্গা নদী এবং সরস্বতী নদী সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার স্তুতির উল্লেখ করে আল-বিরূনী হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস উদ্ধৃত করেছেন। হিন্দুদের বিশ্বাস পুরাকালে গঙ্গার প্রবাহ ছিল স্বর্গে। মৎস্য পুরাণে বলা হয়েছে, 'গঙ্গা পৃথিবীতে আসার পর সাতটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে মধ্যবর্তী প্রধান স্রোতধারা গঙ্গা নামে পরিচিতি।'[৫৭] তিনটি ধারা পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে। সেগুলো হলো, সীতা, চক্ষু ও সিন্ধু। যাউন (যমুনা) নদী কানোজ-এর পশ্চিম দিকের নিম্নাঞ্চলে গঙ্গার সাথে একত্রিত হয়েছে। উভয় নদীর একত্রিত স্রোতধারা গঙ্গাসাগারা নামক স্থানে মহাসাগরে মিলিত হয়েছে। অন্যত্র উল্লেখ আছে যে, ইয়ামুনা (যমুনা) এবং গঙ্গার মিলনস্থলে আছে মহাবৃক্ষ প্রয়োগ। এই বৃক্ষ ভাতা প্রজাতির।[৫৮]

সারাসতি এবং গঙ্গামুখের মধ্যবর্তী স্থানে নর্মদা নদীর মুখ অবস্থিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নদী পূর্বদিকের পাহাড় থেকে নেমে এসে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলে গেছে এবং সোমনাথের প্রায় ৬০ ইয়োযানা[৫৯] (প্রায় ১২০ মাইল পূর্বে) বাহরোয (ব্রোচ) শহরের নিকটে সাগরের সাথে মিলিত হয়েছে।

তিন. গণিত

আল-বিরূনী ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অভূতপূর্ব অবদান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গণিত শাস্ত্রে তাঁর খ্যাতি ও অবদান সুবিদিত। বীজগণিতে লগারিদম পদ্ধতির উদ্ভাবক ছিলেন তিনি। মুসলিম বিজ্ঞানীগণের হাতে গণিত শাস্ত্রের কী অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত

হয়েছিল, 'আল-কানূন আল-মাস'ঊদী' (القانون المسعودى) তার পরিচয়বাহী নিদর্শন। এ গ্রন্থ ছাড়াও শুদ্ধ গণিত শাস্ত্র হিসেবে 'কিতাবুত্-তাফহীম' (كتاب التفهيم) সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান কিতাবুল-হিন্দ (كتاب الهند) ও আল-আছারুল বাকিয়া 'আনিল কুরূনিল খালিয়া (الاثار الباقية عن القرون الخالية) ইতিহাস গ্রন্থদ্বয়ে অভিনবরূপে গণিতের ব্যবহার।

আল-কানূন আল-মাস'ঊদী (القانون المسعودى) গ্রন্থে ত্রিকোণমিতির অধ্যায়টি (তৃতীয় অধ্যায়) দেখলেই বুঝা যায় যে, কত বড় বৈজ্ঞানিক কর্মযজ্ঞ তিনি সাধন করেছিলেন। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে গণিত শাস্ত্রে আল-বিরূনীর অবদান তুলে ধরা হলো:

ত্রিকোণমিতিতে অবদান

ত্রিকোণমিতিতে আল-বিরূনী তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানীগণকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। প্রতিটি গণনাকে শুদ্ধ ও অভ্রান্ত করার জন্য প্রাণপণ সাধনা করেন এবং প্রাপ্ত ফলাফলে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকে বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকার করেননি। তিনি প্রত্যেক ডিগ্রির এক-চতুর্থাংশ অনুসারে গণনা করে তালিকা তৈরি করেন। এ গণনায় তিনি দুটি নিয়ম অনুসরণ করেন। একটি নিয়ম ছিল- সাধারণভাবে গণনা এবং অন্যটি ছিল- সূক্ষ্ম বা বিশুদ্ধ গণনা। সাধারণ গণনার জন্য তিনি আনুপাতিক অংশের নিয়ম ব্যবহার করেন। সূক্ষ্ম বা বিশুদ্ধ গণনায় আল-বিরূনীর অনুসৃত নিয়ম তাঁর যুগ এবং পরবর্তীকালে বিস্ময়কর বলে প্রমাণিত হলেও কৃতিত্ব থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়। মুসলিম বিজ্ঞানীগণের অনেক বৈপ্লবিক কৃতিত্ব ইউরোপীয় চৌর্যবৃত্তির কবলে পড়ে তাদেরই আবিষ্কার বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। আল-বিরূনী কর্তৃক প্রবর্তিত এ নিয়মটি তন্মধ্যে অন্যতম। তাঁর এ আবিষ্কৃত ফর্মূলাটির নাম 'The Formula of Interpolation'। আজ এটিকে আইজাক নিউটনের আবিষ্কার বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ নিউটনের জন্মের ৫৯২ বছর পূর্বে আল-বিরূনী এই ফর্মূলা শুধু আবিষ্কারই করেননি; বরং একে ব্যবহার করে বিশুদ্ধ সাইন তালিকা (তবল)ও প্রস্তুত করেন। তবে তিনি দশমিকের সপ্তম স্থানের পর আর তাকে এগিয়ে নিয়ে যাননি। আল-বিরূনী এত সূক্ষ্মভাবে সাইন তালিকা তৈরি করেন যে, তাতে ভুলের মাত্রা ছিল ১/১০ এর চেয়েও কম। বলাবাহুল্য যে, বর্তমানেও এর চেয়ে সূক্ষ্মতর গণনা হয় না এবং কোন বৈজ্ঞানিক গণনাতেও আঙ্কিক বিশুদ্ধ গণনা হয় না।[৬০]

নির্দিষ্ট অঙ্কের কোণের সাইন নির্ধারণ করেই তিনি থেমে যাননি; বরং তার বিপরীত উপায় অর্থাৎ সাইন জানা থাকলেও অতি নিপুণভাবে তার কোণ নির্ধরাণ করার পন্থা বের করেছেন। তিনি তার ত্রিকোণমিতির প্রমাণ ও স্বতঃসিদ্ধগুলো জ্যামিতিক অঙ্কন ও প্রমাণের সাহায্যে সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করে দাঁড় করিয়েছেন। সাইন তালিকা তৈরি করেই আল-বিরূনী ট্যানজেন্ট তালিকার প্রতি মনোযোগ দেন। তিনি বৃত্তের ব্যাসার্ধ পরিমাণকে এক ইউনিট ধরে নিয়ে ত্রিকোণমিতির সম্পর্কগুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন এবং খুব সহজে এগুলোর জ্যামিতিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন। আল-বিরূনী জ্যোতির্বিজ্ঞানের মধ্য দিয়েই ত্রিকোণমিতিকে উচ্চস্তরে উন্নীত করার কাজে প্রভূত কৃতিত্ব দেখান।

আল-বিরূনী তাঁর আল-কানূন আল-মাস'ঊদীতে বৃত্তাকার ত্রিকোণমিতির আলোচনায় প্রথমে ০° থেকে ৯০° সাইনের মূল্য নির্ধারণ করে একটি Sine table তৈরি করেন। তিনি শুধু প্রত্যেক ডিগ্রির সাইন নির্ধারণ করেই তাঁর কর্তব্য শেষ করেননি; বরং প্রতি ডিগ্রির অংশের সাইনও নির্ধারণ করেছেন। প্রতি ১৫´ করে অংশ বৃদ্ধির জন্য সাইনের পরিমাণে যে তারতম্য হয় তার মূল্য দশমিকের সপ্তম স্থান পর্যন্ত

নির্ধারণ করেন।[৬১] এই তালিকা তৈরি করতে তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তাকে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমে তিনি সুষম বহুভুজের বাহুগুলো ঠিক করে নিয়ে তা থেকে ৬০ ডিগ্রি, ৩০ ডিগ্রি, ৪৫ ডিগ্রি এবং ১৮ ডিগ্রির সাইনের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। তারপর ত্রিকোণমিতিক ও জ্যামিতিক উভয় পদ্ধতিতে সাইনের (A+B) ফর্মূলা নির্ণয় করেন। পরে B=A ধরে নিয়ে তা থেকে সাইন ২অ এর পরিমাণ নির্ধারণ করার উপায় বের করেন। তৃতীয় পন্থাটি জটিল গাণিতিক বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ দিয়েছে। ১৫ ডিগ্রির সাইন নির্ধারণে প্রয়োজন হয় ত্রৈমাত্রিক সমীকরণের সমাধান। জ্যামিতিক ভাষায় তাকে বলা যেতে পারে চাপের এক-তৃতীয়াংশের জন্য জ্যা নির্ধারণ করা। স্তরে স্তরে গণনা করে এ ত্রৈমাত্রিক সমীকরণের সমাধানে আল-বিরূনী তাঁর গ্রন্থের কয়েকটি পরিচ্ছেদ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন। চতুর্থ দফায় সাইনের (A+B) ফর্মূলা পুনঃপুন প্রয়োগ করে তালিকাটি সম্পূর্ণ করেছেন।[৬২]

তাঁর এ ফর্মূলাটির সংক্ষিপ্ত রূপ হলো: $\frac{\text{SinA}}{a} = \frac{\text{SinB}}{b}$ আল-বিরূনীর এই কাজের প্রভাব পড়েছে পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ নাসির উদ্দীন তূসীর কর্মে। আল-বিরূনীর বেশ কিছু উদ্ভাবিত ফর্মূলা নাসির উদ্দীন তূসীর আবিষ্কার বলে চালানো হয়। অথচ ত্রিকোণমিতির নবজীবন দানকারী নাসির উদ্দীন তূসী ছিলেন ২৫০ বছরের পরবর্তী মারাঘার শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানী। ত্রিকোণমিতির জন্য তিনি যে বিজ্ঞান জগতে অমর হয়ে আছেন, তা কিন্তু আল-বিরূনীকে অনুসরণ করার কারণেই হয়েছিলেন।[৬৩]

ত্রিভুজের ৬টি কৌণিক সম্বন্ধের ৪টি গ্রিকরা আবিষ্কার করে। আর অবশিষ্ট দুটি আবিষ্কার করেন আল-বিরূনী। তা হলো,

$$\text{CosA} = \text{CosA SinB}$$
$$\text{Cosc} = \text{CotA CotB}$$ [৬৪]

ট্যানজেন্ট তালিকা তৈরি করতে গিয়ে আল-বিরূনী একটি ফর্মূলা বের করেন। ফর্মূলাটি হলো:

XCY এবং ECW কোন বৃত্তের দুটি ব্যাস। যদি SCY সূর্যের উন্নতি (altitude) হয় তাহলে SM হবে সেই উন্নতির সাইন এবং CM কোসাইন। X বিন্দুতে একটি ট্যানজেন্ট আঁকা যাক। SC বর্ধিত করলে এই ট্যানজেন্টকে তা P বিন্দুতে ছেদ করবে। তাহলে চঢ হবে উন্নতির ট্যানজেন্ট। এমনি বৃত্তের W বিন্দুতে একটি ট্যানজেন্ট অঙ্কন করলে সেই ট্যানজেন্ট যদি CP কে Q বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে WQ হবে উন্নতির কোট্যানজেন্ট। CP হবে সিক্যান্ট এবং CQ হবে কোসিক্যান্ট।

আল-বিরূনী কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হন। তাত্ত্বিক সমাধান অসম্ভব বলে বিবেচিত হওয়ায় তিনি ১২টি যান্ত্রিক উপায় নির্ধারণ করেন, এতে তার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এ উপায়ে তিনি 1^0 ডিগ্রি চাপের যে পরিমাণ নির্ধারণ করেন তা দশমিকের দশম স্থান পর্যন্ত শুদ্ধ। এ নির্ধারিত পরিমাণটি হলো- $1g2^1 – 49^{11} – 51^{111} – 48^{1v}$। আবুল ওয়াফার নির্ধারিত পরিমাপ হলো- $1g2^1 – 40^{11} – 51^{111} – 58^{1v} – ov^1$। আর বর্তমানে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হিসেবে স্বরকৃত পরিমাণ হলো- $1g2^1 – 49^{11} – 51^{111} – 48^{1v} – 0^2 – 25^{11} – 27^{v11}$। অনুরূপভাবে আল-বিরূনী π এর প্রকৃত মান বের করেন। তাঁর স্থিরকৃত পরিমাণ হলো- $3^0 – 80^{11} – 17^{111} – 36^{v1} – 46^{v1} – 30^{v1}$। আল-বিরূনী তাঁর কিতাবুল-হিন্দ (كتاب الهند) গ্রন্থে π এর পরিমাণ নির্ধারণে হিন্দু মনীষীদের ভুল ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে মৎস্য পুরাণে সূর্য ও চন্দ্রের কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে, পরিধি ব্যাসের তিনগুণ। বায়ু পুরাণে ও আদিত্য

পুরাণেও অনুরূপ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পরে হিন্দুরা তাদের ভুল উপলব্ধি করতে পারে। ব্রpগুপ্ত প্রথম প্রকাশ করেন যে, পরিধি ব্যাসের $৩\frac{১}{৭}$ গুণ। কিন্তু তার পরিধি নির্ধারণের পদ্ধতিটি ছিল বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।[৬৫] তাঁর মতে, ১০ এর বর্গমূল যেমন $৩\frac{১}{৭}$ এর প্রায় সমান ব্যাস ও পরিধির অনুপাত ও তেমনি ১ থেকে ১০ এর বর্গমূলের অনুপাতের সমান। ভারতীয় গণিতজ্ঞরা একে $৩\frac{১৭৭}{৯৫০}$ বলে সিদ্ধান্তে পৌছান। হিন্দু মনীষীদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মুসলিম বিজ্ঞানীগণও তাদের একই ফল ব্যবহার করেন। গণিতজ্ঞ ইয়াকুব ইবনে তারিক তাঁর 'কোম্পোজিটো স্কোয়েরাস' নামে গ্রন্থে একই অনুপাত ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, জোডিয়াক-এর পরিধি হলো ১২৫,৬৬০,০০০ যোজন এবং তার ব্যাস হলো ৫০০,০০০,০০০ যোজন।[৬৬]

হিন্দু গণিত

আল-বিরূনী যেহেতু ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণাপূর্বক অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। তাই তাঁর ভারতীয় জ্ঞানের অংশ হিসেবে হিন্দু গণিত সম্পর্কে তাঁর মতামত তুলে ধরা হলো:

আল-বিরূনী লক্ষ্য করেছিলেন যে, গণিত শাস্ত্রে হিন্দুরা সংখ্যা প্রতীকের জন্য তাদের বর্ণমালা ব্যবহার করে না। অপরদিকে মুসলমানরা হিব্রু বর্ণমালার অনুকরণে সংখ্যা প্রতীকে আরবী বর্ণমালা ব্যবহার করত। আল-বিরূনী আরবদের এ রীতিকে বুদ্ধিমানের কাজ বলে মেনে নিতে পারেননি। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে আরবদের ভারতীয় সংখ্যা প্রতীক গ্রহণের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তিনি লিখেছেন, 'আমাদের সংখ্যা লিখন প্রতীক এসেছে হিন্দুদের সুন্দরতম প্রতীক থেকে।' আল-বিরূনী বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে গিয়ে তাদের সংখ্যার ক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। তাতে তিনি দেখতে পান যে, কোন ভাষা এমনকি আরবী ভাষা পর্যন্ত এক হাজার অতিক্রম করতে পারে না। একমাত্র ভারতীয়রা ছিল ব্যতিক্রম। তাদের সংখ্যার ক্রমিক সংখ্যা ছিল অষ্টাদশ পর্যন্ত।[৬৭]

চার. সভ্যতার ইতিহাস প্রণয়নে আল-বিরূনীর অবদান

সভ্যতার ইতিহাস প্রণয়ন আল-বিরূনীর শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম সম্পর্কে আল-বিরূনীই প্রথম ব্যক্তি, যিনি সর্বপ্রথম এসব বিষয়কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা করেছেন। ভারতে অবস্থানকালে তিনি সেখানকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং তার আহরিত জ্ঞান আরবী ভাষায় প্রচার করেন। মুসলিম জ্ঞান-সাধকদের মধ্যে আল-বিরূনীই প্রথম এবং সম্ভবত শেষ- যিনি অমুসলিম সভ্যতা, চিন্তাধারা ও শিল্পকলা সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সাথে অধ্যয়ন করে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক মান নিয়ে সেগুলোর মূল সূত্রসমূহের ব্যাখ্যা ও বিবরণ নিরপেক্ষভাবে লিখে গেছেন।[৬৮]

আজ ভারতের যেকোনো ধরনের প্রামাণিক ইতিহাস রচনায় কিতাবুল-হিন্দ (كتاب الهند) একটি অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আল-বিরূনীর শতাধিক গ্রন্থের মধ্যে একটি গ্রন্থই তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। ইতিহাসকে দার্শনিক দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ইবনে খালদূন। আর তারও প্রায় তিনশত বছর পূর্বে ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন খাওয়ারিজমের সন্তান আল-বিরূনী।[৬৯]

ভারতের ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর অবিস্মরণীয় রচনা কিতাবুল-হিন্দ (كتاب الهند)। ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে এ রকম বৈজ্ঞানিক ইতিহাস সর্বপ্রথম। আল-বিরূনীই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ Indologist বা ভারতীয় ইতিহাসবিদ। তাঁকে ইন্ডোলজির প্রতিষ্ঠাতা (Foundation of Indology) বলা হয়।[৭০] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুনীতি কুমার চ্যাটার্জীর মতে, 'আল-বিরূনী কেবল সর্বপ্রথম নয়; বরং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠদের অন্যতম।'[৭১]

আল-বিরূনী কর্তৃক রচিত আল-আছারুল বাকিয়া 'আনিল কুরূনিল খালিয়া (الاثار الباقية عن القرون الخالية) পুরাকালের বিভিন্ন জাতির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত ইতিহাস। এতে গাণিতিক পদ্ধতির ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। সমস্ত গ্রন্থটি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গণনায় ভরপুর। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ গ্রন্থের সংখ্যা অতীব বিরল। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত বা অধুনা বিলুপ্ত বর্ষ গণনা পদ্ধতি, পর্বাদি, ধর্ম-কর্মের নিয়ম-কানুন ইত্যাদির এমনি বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা আল-বিরূনী ছাড়া অন্য কেউ করেছেন বলে জানা যায় না। কোন উৎসাহী অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করলেও এর চেয়ে বিশেষ কিছু উন্নতি করতে পারবেন বলে মনে হয় না। আল-বিরূনী যে সমস্ত উৎস থেকে অধুনা বিলুপ্ত বিষয়গুলোর উদ্ধার সাধিত করেছিলেন, সে সমস্ত উৎস বর্তমানে যেকোনো লেখকের আয়ত্তের বাহিরে। সে হিসেবে এর মৌলিকত্ব যে চিরকালের জন্য অবিনশ্বর রয়ে যাবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।[৭২]

আল-বিরূনী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ভারতের দীর্ঘ ইতিহাস রচনা করেন। আল-বিরূনীর মাত্র একটি উট বোঝাই করে ভারতীয় বই-পুস্তক সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। সংগৃহীত বই-পুস্তকের পরিমাণ কম হলেও ভারতের উপর তাঁর লেখা ইতিহাসের মান ছিল হিউয়েন সাংয়ের চেয়ে বহুগুণে সমৃদ্ধ। এছাড়াও তিনি পাতঞ্জলীর যোগসূত্র আরবীতে 'কিতাব পাতঞ্জলী' শিরোনামে অনুবাদ করেন।[৭৩]

তাই বলা যায় যে, ভারত এবং দেশটির অধিবাসীদের সম্পর্কে আল-বিরূনীর গভীর ও ঘনিষ্ঠ বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের আলোকে রচিত তাঁর 'কিতাবুল-হিন্দ' গ্রন্থে একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ উপমহাদেশের সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের জানার আগ্রহ পূরণে অমর তথ্যভাণ্ডার রেখে গেছেন।

উপসংহার

আল-বিরূনী সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এক মহাপণ্ডিত। তাঁর মৌলিক আবিষ্কারের উপরই গড়ে উঠেছে আধুনিককালের বিজ্ঞান। মধ্যযুগে যার একান্ত সাধনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিগন্ত এক নব সূর্যের আলোতে উদ্ভাসিত হয়েছিল, তিনি হলেন আল-বিরূনী। ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়াম বলেন, 'মধ্যযুগে বিজ্ঞান সাধনায় আল-বিরূনী ছিলেন শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা। তাঁর ধী-শক্তি, বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে একসূত্রে গেঁথে দেয়ার দক্ষতায় তাঁকে স্থান করে দিয়েছে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুসলিম স্কলারদের আসনে।' অধ্যাপক সাকায়ের বলেন, Al-Biruni was the greatest intelect that ever lived on this earth. -'আল-বিরূনী হলেন বিশ্বের এ যাবৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি।'

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ **খাওয়ারিজম:** খাওয়ারিজম পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত। এটি পারস্যের কেন্দ্রে অবস্থিত। এটি বর্তমানে উজবেকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত। এটি একটি বিশাল প্রদেশ। কাথ এর একটি শহর। যার বর্তমান নাম খিভা। এ শহরে অনেক বিজ্ঞানী, সাহিত্যিকের জন্ম। খাওয়ারিজম আরাল সাগরের তীরে অবস্থিত। এ সম্পর্কে ইয়াকূত আল-হামাভী (র) বলেন,

أوله بين الضمة والفتحة، والألف مسترقة مختلسة ليست بألف صحيحة، هكذا يتلفظون به، هكذا ينشد قول اللحّام فيه:

ما أهل خوارزم سلالة آدم، ... ما هم، وحقّ الله، غير بهائم

أبصرت مثل خفافهم ورؤوسهم ... وثيابهم وكلامهم في العالم

إن كان يرضاهم أبونا آدم، ... فالكلب خير من أبينا آدم

قال بطليموس في كتاب الملحمة: خوارزم طولها مائة وسبع عشرة درجة وثلاثون دقيقة، وعرضها خمس وأربعون درجة

দ্র. *মু'জামুল-বুলদান*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল-কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ.৩৯০।

২ খায়রুদ্দীন আয-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ৫ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ইলম লিলমালাঈন, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৩১৪; উমার রিদা কাহ্হালাহ বলেন, **ولد في 3 ذي الحجة 362 هـ 4 أيلول 973 في ضواحي مدينة كاث**

দ্র. উমার রিদা কাহ্হালাহ, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: মু'আস্সাসাতুর-রিসালাহ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৫৩; ইব্ন আবী উসাইবিআ বলেন, **وأقام أبو الريحان البيروني بخوارزم**

দ্র. ইব্ন আবী উসায়বীয়াহ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা* (বৈরূত: দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৪৫৯; *Encyclopedia of Islamic Science and Scientists* গ্রন্থে আছে, Al-Biruni was born in Khwarazm (now Kara-Kalpakska ya A.S.S.R on September 4,973. He was born and grew up in the region south of the Aral Sea, known in ancient and medieval times as Khwarazm.
Cf. *Encyclopedia of Islamic Science and Scientists*, edited by M.Zaki Kirmani & N.K. Singh, vol.1 (New Delhi: Global vision publishing, 2005), p. 149.

৩ **আল-বিরূনী** (اَلْبِيْرُوْنِيْ): শব্দের বা (باء) অক্ষর যেরবিশিষ্ট, ইয়া (ياء) অক্ষর সাকিন বিশিষ্ট, রা (راء) অক্ষর পেশ বিশিষ্ট, তার পরে ওয়াও (واو) অক্ষর এবং শেষ অক্ষর নূন (نون)। এই নিসবত দ্বারা জ্যোতির্বিদ আবূ রায়হান প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। আল-বিরূনী আত্-তাফহীমসহ অন্যান্য গ্রন্থসমূহের প্রণেতা। তিনি ৪৩০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

দ্র. ইবনুল আছীর, *আল-লুবাব ফী তাহযীবিল-আনসাব*, ১ম খণ্ড (মিশর: দারুস্ সাদর, তা.বি.), পৃ. ১৯৭।

৪ উমার রিদা কাহ্হালাহ, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৩; খায়রুদ্দীন আয-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪; সাহাদত হোসেন খান, *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার* (ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১১৫।

৫ **আল-বিরূনী** (البيروني): ফারসি ভাষায় বেরূন শব্দের অর্থ হলো-বাইরের জেলা। খাওয়ারিজমের (বর্তমানে খিভা) কাথ জেলার বাইরে জন্ম নেয়ায় তিনি বেরূনী নামে পরিচিত হয়ে উঠেন। ইব্ন আবী উসাইবিআ বলেন, **هُوَ الْأُسْتَاذ أَبُو ريحان مُحَمَّد بن أَحْمد البيروني مَنْسُوب إِلَى بيرون وَهِي مَدِينَة فِي السَّنَد (مقاطمة في الباكستان الغربية عاصمتها كراتش**

দ্র. ইব্ন আবী উসায়বীয়াহ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, ৪৫৯; *Encyclopedia of Islamic Science and Scientists* গ্রন্থে আছে, The Site was in the environs (birun, hence hs appellation) of Kath, then one of the two principal cities region.
Cf. *Encyclopedia of Islamic Science and Scientists*, p. 149.

৬ **আল-খাওয়ারিজমী** (الخوارزمي): তিনি আল-খাওয়ারিজমে জন্মগ্রহণ করেন, তাই সে দিকে সম্বন্ধ করে তাঁকে আল-খাওয়ারিজমী বলা হয়। *Encyclopedia of Islamic Science and Scientists* গ্রন্থে আছে, ... Known in ancient and medieval times as Khwarazm, the twon of his birth now bears his name.

Cf. *Encyclopedia of Islamic Science and Scientists*, vol.1, p. 149.

৭ উমার রিদা কাহ্হালাহ, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড পৃ. ৫৩; ইব্ন আবী উসাইবিআ, *উয়ূনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ৪৫৯; খায়রুদ্দীন আয-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪; ইসমাঈল বাশা আল-বাগদাদী, *হাদিয়াতুল আরিফীন*, ২য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, ১৪০২হি./১৯৮২খ্রি.), পৃ. ৬৫-৬৬; M. plassner, *The Natural Sciences and Medicine in the legacy of Islam*, ed. by J. Schacht and CE Bosworth (Oxford: The Clarendon press, 2^{nd} edn, 1974), p. 436.

৮ মুহাম্মাদ নূরুল আমীন, *বিশ্বসেরা মুসলিম বিজ্ঞানী* (ঢাকাঃ ব্যাকস পাবলিকেশন্স, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৫৬।

৯ সাহাদত হোসেন খান, *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১১৫, ১২০।

১০ Chatterji, Suniti Kumar, *Al-Biruni and Sanskrit*, *in Al-Biruni Commemoration volume* (Calcutta: Iran Society, 1951), p. 83-84.

১১ *Encyclopedia of Islamic Science and Scientists*, vol.1, p. 149; সাহাদত হোসেন খান, *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১১৭।

১২ সাহাদত হোসেন খান, *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১১৭; মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিশ্বসেরা মুসলিম বিজ্ঞানী* পৃ. ৫৬; নূরুল হোসেন খন্দকার, *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডশন, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১২১।

১৩ মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিশ্বসেরা মুসলিম বিজ্ঞানী* পৃ. ৫৭।

১৪ সাহাদত হোসেন খান, *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১১৭-১১৮।

১৫ আবদুল মওদুদ, *মুসলিম মনীষা* (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭০ খ্রি.), পৃ. ১০৮; নূরুল হোসেন খন্দকার, *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান*, পৃ. ১২১; মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিশ্বসেরা মুসলিম বিজ্ঞানী* পৃ. ৫৭।

১৬ নূরুল হোসেন খন্দকার, *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান*, পৃ. ১৩২-১৩৩।

১৭ আবদুল মওদুদ, *মুসলিম মণীষা*, পৃ. ১০৯; খায়রুদ্দীন আয-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪।

১৮ ইব্ন আবী উসাইবিআ, *উয়ূনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ৪৫৯; মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিশ্বসেরা মুসলিম বিজ্ঞানী* পৃ. ৬০।

১৯ ইব্ন আবী উসাইবিআ, *উয়ূনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ৪৫৯; সাহাদত হোসেন খান, *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১৩১; নূরুল হোসেন খন্দকার, *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান*, পৃ. ১২৮।

২০ ইব্ন আবী উসাইবিআ, *উয়ূনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ৪৫৯; সাহাদত হোসেন খান, *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১৩৬; নূরুল হোসেন খন্দকার, *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান*, পৃ. ১৩১-১৩২।

২১ ইব্ন আবী উসাইবিআ, *উয়ূনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ৪৫৯; আবদুল মওদুদ, *মুসলিম মণীষা*, পৃ. ১০৯-১১০।

২২ ইব্ন আবী উসাইবিআ, *উয়ূনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ৪৫৯; খায়রুদ্দীন আয-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪; উমার রিদা কাহ্হালাহ, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড পৃ. ৫৩-৫৪।

২৩ আবদুল মওদুদ, *মুসলিম মনীষা*, পৃ. ১০৯-১১০।

২৪ খায়রুদ্দীন আয-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪; উমার রিদা কাহ্হালাহ, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড পৃ. ৫৩; ইব্ন আবী উসাইবিআ বলেন, (وتوفي في عشر الثلاثين والاربعمائة (৪৪০هـ – ১০৪৮م

দ্র. *উয়ূনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ৪৫৯।

২৫ *Muslim contribution to Science and Technology* গ্রন্থে আছে, This famous Scientist, one of the greatest of all times, died 1050.

Cf. Board of Researchers, *Muslim contribution to Science and Technology* (Dhaka: Islamic Foundation, 2012), p. 265.

[২৬] উমার রিদা কাহ্হালাহ, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড পৃ. ৫৩।

[২৭] খায়রুদ্দীন আয-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪।

[২৮] Chatterji, Suniti Kumar, *Al-Biruni and Sanskrit*, p. 83-84.

[২৯] SK Hamarneh, *origin of pharmacy and Therapy in the Near East* (Tokyo: The National Foundation, 1937), p. 50-52; Sir Tomas Arnold Alfred Guillaume, *The legacy of Islam* (London: Oxford University press,1931), p. 331.

[৩০] SK Hamarneh, *origin of pharmacy and Therapy in the Near East,* p. 53-54.

[৩১] *Ibd,* p. 50-87.

[৩২] এম.আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের দান*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: মালিক লাইব্রেরী, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ৩৯২।

[৩৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৪।

[৩৪] *মুসলিম মনীষা*, পৃ. ১০৮-১০৯; আখতার উজ্-জামান, *জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান* (ঢাকা: সোলেমানিয়া বুক হাউজ, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ২৬৮; ভূগোলশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

[৩৫] Ahmed Akhbar S, *Al-Beruni: The First Anthropologist RAIN* (Published by Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland), 60 (60): Pp. 9-10; Ph.D, Joseph J. kerski, *Interpreting our World: 100 Discovers That Revolutionized Geography,* p. 12; সাহাদত হোসেন খান, *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার* (ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ১১৮।

[৩৬] G. Sarton, *Introduction to the History of Science,* vol. 1 (New York: RE Krieger publishing co. Huntington, 1975), p. 637; *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১১৮; *মুসলিম মনীষা*, পৃ. ১০৯।

[৩৭] *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১১৫, ১১৮।

[৩৮] **The Astrolabe:** Amid the plethora of medieval tretises on the astrolabe, this is one of the law of real value. It describes in detail not only construction of the standard astrolabe but also special tools used in the process. Numerical tables are given for lying out the families of circles engraved on the plates fitting into the instrument. Description are also given of the numerous unusual types of astrolabes that had already been developed in Birunis time. As for the underlying theory, not only are the techniques and properties of the standard stereographic projection presented, but also those of certain non-stereographic and non-orthogonal mappings of the sphere upon the plane.

Cf. E.B. Al-Biruni, Abu Rayhan Muhammad Ibn Ahmed, *Encyclopedia of Islamic Science and Scientists,* vol. 1 (New Delhi: Global Vision publishing house), p. 156.

[৩৯] *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১১৫; ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলিম ভূগোলবিদদের অবদান, দৈনিক আল-ইহসান, ঢাকা, বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০।

[৪০] **ট্রাইঅ্যাংগলেশন (**Triangulation**):** ট্রাইঅ্যাংগলেশন কৌশল হলো সরাসরি বিন্দুর দূরত্ব পরিমাপের পরিবর্তে কোন স্থির তলের উভয় প্রান্তের জ্ঞাত বিন্দু থেকে কোণগুলো পরিমাপ করে কোন বিন্দুর অবস্থান নির্ণয়ের পদ্ধতি।

দ্র. *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১১৯।

[৪১] Sayyed Hossain Nasr, *Islamic Science : An Illustrated Study* (Kazi publications, Inc, 2007), p. 42.

[৪২] David A. King, *World Maps for Finding The Direction and Distance to Mecca : Innovation and Tradition in Islamic Science* (Brill Academy Publication, 1999), p. 344.

[৪৩] J.D. Bernal, *Science in History,* vol. 1 (The MIT Press, 1971), p. 277.

[৪৪] *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১২৬।

[৪৫] Dr. Edward C. Sachau, *Al-Beruni's India,* vol. 1 (London: KRGAN PAUL, TRENCH, TRUBNER & Co. Ltd, 1910), p. 197.

[৪৬] *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১২৬।

[৪৭] *Al-Beruni's India,* vol. 1, p. 208.

[৪৮] *Ibid,* p. 197.

[৪৯] এখানে আল-বিরূনী স্পষ্টত আরাকান অঞ্চলের সাথে আদম সেতুর (বেশ কিছু বালুময় দ্বীপের ধারাবাহিক অবস্থান) নিকটবর্তী ভারত উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তকে মিলিয়ে ফেলেছিলেন।

[৫০] *Al-Beruni's India,* vol. 1, p. 258.

[৫১] ভূবনাকোসা প্রাচীন হিন্দু ভূগোল শাস্ত্র।

[৫২] *Al-Beruni's India,* vol. 1, p. 198.

[৫৩] *Ibid,* p. 257.

[৫৪] *Ibid.*

[৫৫] *Ibid,* p. 259.

[৫৬] *Ibid,* p. 262.

[৫৭] *Ibid,* p. 261.

[৫৮] *Ibid,* p. 170.

[৫৯] আল-বিরূনীর মতে, এক ইয়োযানা ৮ আরবী মাইলের সমান বা ৩২০০০ গজ এবং ১ ক্রোশ ২/১ ইয়োযানা। Cf. *Al-Beruni's India,* vol. 1, p. 167.

[৬০] Hermelink, H., *Zentralblatt Fur Mathematik und ihre Grenzgebiete,* 54, 1956, p. 3; C. Brockelmann, *Geschichte der Arabischen Litteratur,* vol. 1 (Leiden: E.J. Brill, 1937), Supplement, p. 854; *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১৩৪; নূরুল হোসেন খন্দকার, *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১২৬; *জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, পৃ. ১০২।

[৬১] এম আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: মালিক লাইব্রেরী, ১৯৫২ খ্রি.), পৃ. ৬৪; জ্ঞান-*বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, পৃ. ৯৮-৯৯।

[৬২] Suter, H., Das Buch der Auffindung der Schnen im Krreise ....., Bobliotheca mathematica, 11, 1910, Pp. 60-78; *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১৩৪-১৩৫।

[৬৩] *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭; *বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম অবদান*, পৃ. ১২৬।

[৬৪] Board of Researchers, *Muslim Contribution to Science and Technology* (Dhaka: Islamic Foundation, 2012), p. 81.

[৬৫] *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪; *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১৩৫; জ্ঞান-*বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, পৃ. ১০০-১০১।

[৬৬] *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১৩৫-১৩৬।

[৬৭] আবূ রাইহান মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-বিরূনী, *ভারততত্ত্ব* (তাহকীক-ই হিন্দ বা তারীখ-উল হিন্দ), মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস অনূদিত (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ১০৯-১১০।

[৬৮] *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১২০; *মুসলিম মনীষা*, পৃ. ১০৯।

[৬৯] মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান* (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ২০৯; *বিশ্বসেরা মুসলিম বিজ্ঞানী*, পৃ. ২৬০।

[৭০] Boilot, D.J., *Al-Beruni (Beruni),* Abdul Rayhan Muhammad b. Ahmad, New Ed., 1, Pp. 1236-1238; *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১১৫, ১২০।

[৭১] He was the first of scientific Indologists and one of the greatest of all time. cf. Chatterji, Sunit Kumar, *Al-Biruni and Sanskrit,* Pp. 83-84.

[৭২] *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান*, পৃ. ২০৮-২০৯।

[৭৩] *স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার*, পৃ. ১২০।